প্রতিটা ক্যালেন্ডার খুলে দেখে নেওয়া ছবিগুলো। কোনওটায় লক্ষ্মী–গণেশ, কোনওটায় নারায়ণ তো কোনওটায় মনীষীদের ছবি। ঠাকুরের তাকের উপরে পেরেকে ঝুলতে থাকা মা দুর্গার ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের জায়গায় স্থান পেত নতুন কোনও দেবতার ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার। আর আমিও বিস্ময়ে দেখতাম বাংলার তারিখ। কেমন ছয় আর আটের মাঝে সাত তারিখের জায়গায় গোল কালোতে লেখা অমাবস্যা, কুড়ি আর বাইশের মাসে অর্ধেক চাঁদের ভিতরে একাদশী। আর সেইসঙ্গে কত নতুন শব্দ ঢুকে পড়ত আমার সীমিত জ্ঞানের ভাণ্ডারে ... গাত্রহরিদ্রা, সাধভক্ষণ, অম্বুবাচী

আমাদের রোজকার অভ্যস্ত জীবনে হাতে গোনা যে ক'টা বাংলা তারিখ আমরা মনে রাখি, এই বৈশাখেই তার দু'টো দিন নির্দিষ্ট হয়। পাড়ায় পাড়ায় ছবিতে মালা দিয়ে, কিশোরীর অপটু হারমোনিয়ামে রবীন্দ্রসংগীত কানে এলে বুঝতে পারি আজ ৮ বা ৯ মে নয়, আজ পঁচিশে বৈশাখ আর বৈশাখের এই সূত্রটা গেঁথে দেয় যে তারিখ–সেটা পয়লা বৈশাখ। এপ্রিল মাসের ১৪ বা ১৫ তারিখে নিয়ম করে নববর্ষ আসে – কিন্তু বছরের মাঝেই হঠাৎ করে কেমন ভুলে যাই, এটা কোন বঙ্গাব্দ চলছে। হয়তো নিজেকেই প্রশ্ন করি, এটা যেন চোদ্দশো কত? কখনও উত্তর মেলে। কখনও বাড়ির খবরের কাগজ দেখেই জেনে নেওয়া সঠিক সালটা। কিন্তু তার মাঝে যে কখন সতেরোই শ্রাবণ, একুশে আশ্বিন, বাইশে ফাল্গুন কিংবা ঊনতিরিশে চৈত্র চলে যায় – ঠিকমতো মনেই থাকে না। তবু পয়লা বৈশাখ আমার নিজস্ব দিন। নতুন বছরের প্রথম দিন। চিরাচরিত অভ্যেস মতো ফার্স্ট জানুয়ারি হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে একগুচ্ছ রেজিলিউশন নিয়ে জীবনের যে পথ চলা শুরু হয়, একমাস কাটতেই দেখা যায় তার একটাও মানা হয় না সঠিকভাবে। কিন্তু নববর্ষে যেন সেই সংকল্পগুলোকেই আবার ঝালিয়ে নেয় মন। আবার নতুন করে নতুন উদ্যমে পথ চলার প্রেরণা পায় জীবন। তাই, পয়লা বৈশাখ কেবল বছরের নয় – অন্যভাবে বাঁচার একটা উদ্যোগের দিনও বটে। সেইসঙ্গে বাঙালিয়ানা আর স্মৃতির ভিতর চাপা পড়ে থাকা অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী প্রতিবছর ফিরে আসে এই বৈশাখের ভোরে। হোয়াটস অ্যাপ–এর মেসেজে বর্ষবরণের শুভেচ্ছা পড়তে পড়তেই কখন যে বুকের ভিতর থেকে ধুলো জমা সাদা–কালো স্মৃতিগুলো আবার রঙিন হয়ে ওঠে বোঝা যায় না ঠিকমতো। বছর বদলায়, সময় বদলায় শুধু বদলায় না একটা তারিখ। পয়লা বৈশাখ। শুধু বছরের পর বছর বদলে যায় আমাদের দেখাটুকু, আমাদের অবস্থানটুকু...।

মনে পড়ে, ছোটবেলার পয়লা বৈশাখ। স্কুল এমনিই ছুটি। মার্চের শেষ থেকে অ্যানুয়েল পরীক্ষা শুরু হত আর এপ্রিলের দশ তারিখের মধ্যে গুটিয়ে যেত তার পালা। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রেজাল্ট। তাই এ সময়টা ছিল আমাদের মুক্তির সময়। দিনে তিনবেলা মাঠে নেমে ফুটবল খেলা, রাতে লোডশেডিং হলে তো সোনায় সোহাগা। আবার বেরিয়ে পড়ো রাস্তায়। অল্প চাঁদের আলোয় বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরির খেলা আর তারই মাঝে এসে পড়ত নতুন বছর। পুজোয় বরাদ্দ নতুন জামার আনন্দ ততদিনে ফিকে, শীতের সোয়েটারও উঠে যেত ট্রাঙ্কে। গত বছরের হাফ শার্ট আর ছোট হয়ে যাওয়া হাফ প্যান্টে তখনও লেগে থাকত ন্যাপথালিনের গন্ধ। কিন্তু এ সবের মধ্যেই হঠাৎ একদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের আলমারি থেকে বেরিয়ে আসত নতুন জামা, নতুন প্যান্ট। মনে মনে ভেসে যেতাম খুশিতে। বাড়ির বড়'রা বলতেন, বছরের প্রথমদিন নতুন জামা কাপড় পরলে সারাবছর নাকি নতুন পোশাক পরা যায় ...। আর এই জামা গায়ে গলাতে গলাতে রং ওঠা আলমারিটাকে মনে হত আলিবাবার গুপ্ত গুহা। যেন কোনও একদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে চিচিং ফাঁক বললেই খুলে যাবে তার দরজা – বেরিয়ে আসবে রঙিন গেঞ্জি, জিন্সের ফুল প্যান্ট ...। বুঝতাম, বছরের প্রথমদিন মানে পুরোনোকে সরিয়ে গায়ে নতুন কিছু জড়িয়ে নেওয়ার দিন, নতুন করে স্বপ্ন দেখার দিন। আচ্ছা, তাই বুঝি এটাকে নববর্ষ বলে! ছুটে চলে যেতাম আয়নার সামনে ...। নিজেকেও নতুন পোশাকে কেমন যেন নতুন মনে হত...। আর তারই মধ্যে নেমে আসত সন্ধে। রাস্তার ওপারে শ্যামলদার মুদিখানার দোকানে, পোদ্দার স্টেশানার্সে, মালাকার জুয়েলার্সের সামনে ঝুলত রজনীগন্ধা, বেল আর জুঁই ফুলের মালা। কোনও কোনও দোকানের সামনে রাখা বক্স – একটানা বেজে চলেছে 'এমন মধুর সন্ধ্যায়, একা কী থাকা যায়!' কিংবা 'বলছি তোমার কানে কানে, আমার তুমি'। বৃহস্পতিবারের চিত্রমালায়, শনিবারের ওয়েসিস, অনুরোধের আসরে যে গানগুলো লুকিয়ে শুনতে হত, বৈশাখের প্রথম সন্ধেবেলাতে সেই সব কেমন হাওয়ায় না চাইতেই মিশে গিয়ে ধরা দিত কানে। আর কে না জানে, কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশের পথটা যে নিতান্তই সহজ আর সরল। অন্ধকার একটু ঘন হলেই বেরিয়ে পড়া এই দোকানগুলোর দিকে, বাবার হাত ধরে। আর এই দোকান মিষ্টির প্যাকেট, ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সরবত খাওয়ায় তো ওই দোকান হাতে গুঁজে দেয় দুটো লজেন্স। হালখাতা ঠিক কী বস্তু– তা বোঝা না গেলেও সেইসময় আমার হাল হকিকৎ যে একদম আহ্লাদে আটখানা হত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকত না। বাড়ি ফিরে মা–দিদি–বাবা দেখত, গল্প করত কোন দোকানের প্যাকেট কত ভালো হয়েছে – আমি শুধু তাকিয়ে থাকতাম ওই প্যাকেটে বন্দি ক্ষীরের মিষ্টিগুলোর দিকে। প্রতিটা ক্যালেন্ডার খুলে দেখে নেওয়া ছবিগুলো। কোনওটায় লক্ষ্মী–গণেশ, কোনওটায় নারায়ণ তো কোনওটায় মনীষীদের ছবি। ঠাকুরের তাকের উপরে পেরেকে ঝুলতে থাকা মা দুর্গার ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের জায়গায় স্থান পেত নতুন কোনও দেবতার ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার। আর আমিও বিস্ময়ে দেখতাম বাংলার তারিখ। কেমন ছয় আর আটের মাঝে সাত তারিখের জায়গায় গোল কালোতে লেখা অমাবস্যা, কুড়ি আর বাইশের মাসে অর্ধেক চাঁদের ভিতরে একাদশী। আর সেইসঙ্গে কত নতুন শব্দ ঢুকে পড়ত আমার সীমিত জ্ঞানের ভাণ্ডারে ... গাত্রহরিদ্রা, সাধভক্ষণ, অম্বুবাচী – কত কী! পয়লা বৈশাখ মানে তো শুরুর দিন – তাই বিস্ময়ের ঘোরটাও যেন শুরু হত সেইদিন থেকেই । সবকিছুই বড্ড বেশি নতুন লাগত যে ...।

পয়লা বৈশাখ, আরও একটা আনন্দকেও যেন নিয়ে আসত বৈশাখী ঝড়ের মতো। এই দিনের ঠিক পঁচিশ দিন পর পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী। তাই বড়রা, ছেলেদের দল, মেয়েদের দল গান, নাচ, নাটক করবে। আমরা ছোট, আমাদের কপালে বড়ো জোর একটা আবৃত্তি কিংবা চণ্ডালিকায় একবার হেঁটে যাওয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর রোল জুটবে। কিন্তু তাতে কী! এইদিনেই তো শুরু হবে অনুষ্ঠানের মিটিং আর তারপর? প্রথমবার জানতে পারব শ্যামার উত্তীয়, মুকুটের ইশা খাঁ, শেষরক্ষার